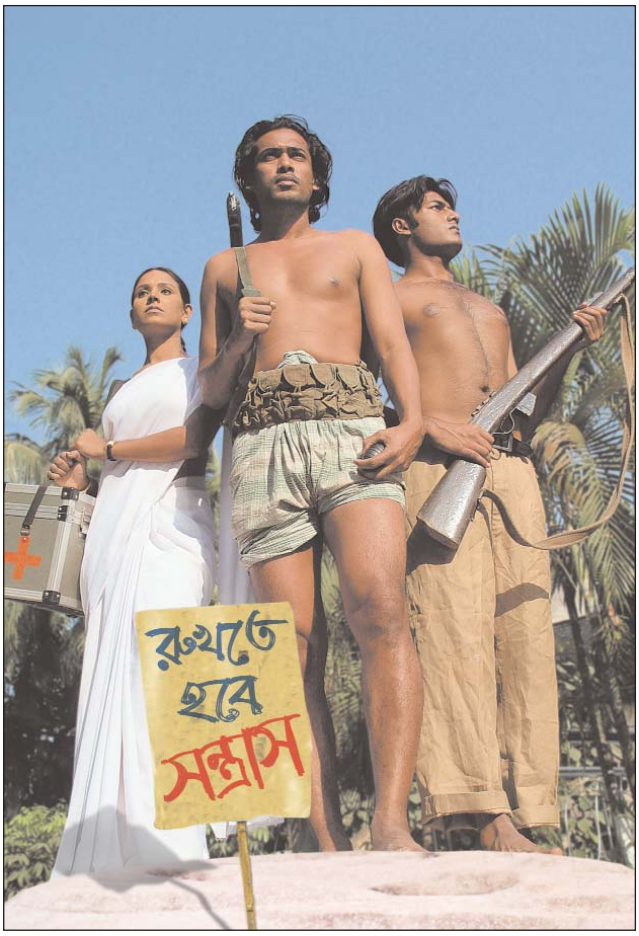

অপরাজেয় বাংলা
প্রাণ সঞ্চারিত হোক

শাহাদত চৌধুরী

বিজয়ের মাসে এলে কাগজে কাগজে রচিত হয় শোকগাঁথা। বিজয়ের কথা বলি অনুচ্চ কণ্ঠে, বিজয় কেতন ওড়াতে যেন দ্বিধা করি। এটা নিয়ে গভীরে চিন্তা করলে কয়েকটি কারণ বের হয়ে আসে। এখানে সেগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ক. স্বাধীনতার মর্মবাণী জাতীর জীবনে প্রথিত ও প্রসারিত হয়নি। যার জন্য জাতির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ব্যক্তিসত্তা বিচ্ছিন্ন। একটি মুক্তিযুদ্ধে এই বিচ্ছিন্নতায় ব্যক্তি ত্যাগই প্রধান হয়ে আসে বিজয়ের মাসে।

খ. একজন যোদ্ধাকে প্রতিনিয়ত প্রমাণ করতে হয় নিজের বীরত্বের কথা। যুদ্ধে প্রামাণ্য কিছু থাকে না। বিজয়ই তার একমাত্র প্রমাণ। এই বিজয়ের অংশিদারিত্ব সব সময় ক্ষমতাসীনরা, সমাজপতিরা বন্টন করে নিজের মত করে সুযোগ মতো। এখন প্রমাণ যা পাওয়া যায় তা হলো ব্যক্তির ব্যক্তিগত ত্যাগ, ক্ষয় ক্ষতি। সেটা সবাই দেখেছে বা জানে। সেটাই তখন সে তুলে ধরতে চায়।

গ. একজন নিজেকে যুদ্ধে ক্ষত, ক্ষতিগ্রস্ত বললে সরকারি সহায়তা পায়, যোদ্ধারা যুদ্ধ শেষে এ ধরনের কিছু পায়নি।

ঘ. যুদ্ধ শেষে ত্রিশ ভাগ চাকরি সংরক্ষিত করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে,

প্রতিপক্ষ করা হয়েছে সাধারণ মানুষের। এ দিকে মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধাকালীন নেতা ফিরে গেছেন ক্যান্টনমেন্ট। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তার 'পোলা-পান'দের ইচ্ছে মতো সার্টিফিকেট দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধার। যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারীদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে।

ঙ. গ্রাম্য রাজনীতিতে মোড়লরা ক্ষমতা বলয়ে নবাগত গ্রহণ করেনি, তারা দলমত ছাড়াই নিজদের ক্ষমতা বজায় রাখতে প্রতিহত করেছে শক্তির নতুন বিন্যাস। একক হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন মুক্তিযোদ্ধারা।

চ. মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নানাবিধ অবস্থান থেকে নিজের প্রয়োজন মতো মুক্তিযুদ্ধের একটি 'সাব কালচার' তৈরি করেছে। মূল ঘটনা বাদ দিয়ে বিতর্কে গেছে যুদ্ধের অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে। মধ্যবিত্ত মূলত ত্যাগের চিত্র এঁকে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে এবং সফলও হয়েছে। যার জন্য বিজয়ী যোদ্ধারা রূপকে পরিণত হয়ে গেছে, হয়েছে শোকগাথার অংশ।

এখানে তাৎক্ষণিকভাবে কারণগুলো বলা হলো, সাংবাদিকসুলভ। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানীরা বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখতে পারেন। দেখা দরকার এই জন্যে যে এটা কি বাঙালির জাতীয় চরিত্র : নিজেকে ব্যথিত দেখতে চায়, চায় বিয়োগান্তক চরিত্রে?

এখানেই আমাদের আপত্তি। '৭১ই প্রমাণ বাঙালি বিনীত হলেও মুহূর্তে রুখে দাঁড়াতে পারে, গড়ে তুলতে পারে ভয়াবহ প্রতিরোধ।

আমাদের এই ব্যাখ্যাটা পুরোটাই ভুল হতে পারে। হতে পারে মূল কারণ আমরা দেখেও না দেখার ভান করছি। দেশের মানুষ শান্তিতে নেই। প্রত্যেকে কোনো মতে নাকটা উঁচু করে রেখেছে বেঁচে থাকার জন্য। পুরো সমাজ, এই সমতল এখন নতুন ভাবে ক্রমশ আক্রান্ত হয়েছে। নতুন হানাদারের পদসঞ্চার চারদিকে, সব ক্ষেত্রে সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের কাছে সরকার পদানত, বিরোধীদল পদানত, পদানত এই জনপদ। যার জন্য বিমর্ষ, যার জন্য এই শোকগাথায় বিলাপ করতে চায়। বিজয় যেন চোখে দেখতে পাচ্ছে না। অথবা বাঙালি দুঃখী হয়ে অতীতে ফিরে যায় সুখের সন্ধানে।

জেমিনী নিউজের একজন সাংবাদিক নব্বই দশকের প্রথম দিকে ঢাকায় ছিলেন। কিছুদিন আগে তার সঙ্গে কথা হলো। তার একটি বক্তব্য খুব স্পষ্ট : বাঙালির চোখ দুটো সামনে নয়, মাথার পেছনে বসানো।

তার কথা হলো, 'তোমরা অতীতকে আঁকড়ে থাকো, সামনে এগুতে চাও না।'

এই সাংবাদিকের সঙ্গে একমত হবার প্রয়োজন নেই। তবে এটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। এটা সত্যি আমাদের সব সুখের বর্ণনায় রয়েছে শুধু অতীত কাল। যেমন 'আমরা দুধে ভাতে ছিলাম'। এটা শতাব্দী ধরেই অতীত কাল। আজ এই আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে কথাগুলো আনছি না। আমরা মধ্যবিত্ত মূলত অতীত নিয়ে বিতর্ক করে যাচ্ছি, মুক্তিযুদ্ধের সীমা নির্ধারণ করেছি, নিজস্ব সাবকালচারে আবদ্ধ রাখার জন্য, মিউজিয়ামে রাখার জন্য। স্মৃতিনির্ভর শোকগাথা রচিত হয় একই কারণ। আকারে নিজের মাপ অনুযায়ী ছোট করে ফেলায় জনগণের বিশ্বাস, বিশাল শক্তি আজ প্রশ্নের মুখে।

আজ সন্ত্রাসের প্রকার ভেদ কি কে বেশি সন্ত্রাস করেছে এ বিতর্কে যেতে কেউ আগ্রহী নয়। এই সরকারকে জনগণ নির্বাচিত করেছে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য। কিন্তু ফলাফল কি দাঁড়ালো? দলনেত্রী আর্মি নামালেন সন্ত্রাস দমনে। আপত্তি উঠলো নিজের দলের ভেতর থেকেই। এটা মানা গেলে যেতে পারে কিন্তু আপত্তি তুললো বিরোধীদলও।

দু'দলই মুক্তকণ্ঠে দাবি করলো সন্ত্রাসীদের নিজ দলের ত্যাগী রাজনৈতিক কর্মী বলে। এখানে এসে দু'দল ঐকমত্যে পৌঁছালো। কারণ সব দলই এখন সন্ত্রাসীদের পুরো নিয়ন্ত্রণে। কেউ ভূমি দস্যু, কেউ ঋণখেলাপি, কেউ নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ, সবাই চলে কানেকশন ঠিক রেখে। ক্ষমতা দখল এখন এরাই করতে চায়।

রাজনীতি, ব্যবসা থেকে 'উন্নয়ন' পর্যন্ত সন্ত্রাসী দখলে। এক অদ্ভুত গণতন্ত্র চলছে। এমপিরা কথা বলেন না কারণ 'ফ্লোর ক্রসিং' করলে সদস্যপদ হারাতে হয়। কেউ যদি ভিন্নমত পোষণ করতে চান তবে তাকে দলত্যাগী হতে হবে। অতএব তারা সংসদে বসে রঙ্গরসিকতা করে জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন শেষ করেন। এবং এক সন্ত্রাসীর অভিভাবক হয়ে তাকে দিয়ে আখের গুছিয়ে নেন।

রাজনীতি, ব্যবসা থেকে 'উন্নয়ন' পর্যন্ত সন্ত্রাসী দখলে। এক অদ্ভুত গণতন্ত্র চলছে। এমপিরা কথা বলেন না কারণ 'ফ্লোর ক্রসিং' করলে সদস্যপদ হারাতে হয়। কেউ যদি ভিন্নমত পোষণ করতে চান তবে তাকে দলত্যাগী হতে হবে। অতএব তারা সংসদে বসে রঙ্গরসিকতা করে জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন শেষ করেন। এবং এক সন্ত্রাসীর অভিভাবক হয়ে তাকে দিয়ে আখের গুছিয়ে নেন...

কে প্রতিবাদ করবে?

মুক্তিযোদ্ধাদের সবাই এখন প্রায় পঞ্চাশ পার করেছেন। রূপক হয়ে শিল্পী আবদুল্লাহ খালেদের অপরাজেয় বাংলা দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তরভূত। ওরা কি ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়েই থাকবে? দেখবে তাদের বিজয় কাদের হাতে দলিত হচ্ছে। এই জনপদের মানুষও কি স্মৃতিনির্ভর শোকযাত্রী হবে বিজয়ের মাসে?

মনে হয় না। মানুষের দৃষ্টি সামনে প্রসারিত হবে, উঠে দাঁড়াবে, অপরাজেয় বাংলা পাষাণে প্রাণ সঞ্চার হবে, আবারো রুখে দাঁড়াবে কি।

খালেদা-হাসিনা দু'জন জনগণেরই নেতা। আপনারা দু'জন কতিপয় এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান, লড়াই জনগণই করবে। '৭১-এ জনগণ প্রাণ দিয়েছে, এবারো দেবে।

অপরাজেয় বাংলায় প্রাণ সঞ্চার ঘটুক। বিজয়ী মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক বিজয়ের গান।

৩১ বছরের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা অন্তকালের।